1996

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন
ও
ইসলামে মুক্তির মাপকাঠি

চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান
ও
মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন
ও
ইসলামে মুক্তির মাপকাঠি

চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান
ও
মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী

প্রকাশক ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত [redacted]
৪, বকশীবাজার রোড,
ঢাকা, বাংলাদেশ।

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আমীর হোসেন
ও
মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৩শে মার্চ, ১৯৮৯ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১৬/১০/৯৬ ইং।

মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ আহমদীয়া আর্ট প্রেস
৪, বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১

পড়ত। মানুষের ধর্ম কর্ম ও ন্যায় নীতির যদি কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব বা হিসাবের পরওয়া না থাকত তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই সে বেহিসাবী উশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যের শিকার হয়ে পড়ত। মানবাত্মার পূর্ণতা বা ইহজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধি অনুভূতি ও কাজ কর্মের পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনা।

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইসলাম তাই অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। কতকগুলি বুনিয়াদী বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা একজন মুসলিমের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কিন্তু পরকালে বিশ্বাস আর খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস একই সাথে সংযুক্ত (কোরআন ৫:৭০)। বস্তুত, পরকালে অবিশ্বাস আর ধর্মে অবিশ্বাসে কোন পার্থক্য নেই। কারণ পরকালের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হলে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বও অস্বীকার করতে হয় এবং সৃষ্টিকর্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিশ্বাস অসঙ্গত ও অসামঞ্জস্য হয়ে পড়ে।

পবিত্র কোরআন পরকাল প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্যের অবতারণা করেছে। সাধারণ মানুষের ধ্যান ধারনার দিকে ইঙ্গিত করে কোরআন বলে: "ইহলোকের জীবন ছাড়া আমাদের অন্য কোন জীবন নেই, পূর্বেও আমাদের কোন জীবন ছিল না। বর্তমানেই আমরা বেঁচে আছি এবং মরব এবং আমরা কখনই পুনরোত্থিত হবোনা" (কোরআন ২৩:৩৮)। অন্যত্র কোরআন

বলে : "মানুষ বলাবলি করে, কি ! আমি যখন মরে যাব তখন আবার সত্য সত্যই কি আমি পুনরুজ্জীবিত হব ? মানুষ কি স্মরণ করেনা যে ইতোপূর্বে নিতান্ত নগণ্য অবস্থা থেকে আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি ?" (কোরআন ১৯:৬৭—৬৮)।

বস্তুতঃ মানুষ তথা সমগ্র বিশ্ব চরাচরই যে এক নিতান্ত তুচ্ছ অবস্থা থেকে সৃষ্ট হয়েছে তা সর্বজনস্বীকৃত। তাই এ কথা নিয়ে বিবাদ করা নিতান্তই স্থূল বুদ্ধির পরিচায়ক যে, যেহেতু বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুভূত হয় যে মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে তার জড়দেহ লয় পেতে থাকে তাই তার সমস্ত অস্তিত্বও বুঝি বিলীন হয়ে গেল। মানুষের সুস্থ বিবেক, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা এ ধরণের সৃষ্টির পরিপন্থী। পরন্তু, পরিবর্তনশীল ও ক্রমবিবর্তনের অনন্ত গতিপথের এক অন্যতম স্তরে মানুষের এই ইহলৌকিক জীবন এই উপলব্ধিকেই বলীয়ান করে যে এই ধারাবাহিকতা সুদূরপ্রসারী। তদুপরি একান্ত 'নাস্তি' অনস্তিত্ব থেকে ক্রম বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষের উৎপত্তি, যেমন এক মহাশক্তিধর সৃষ্টিকর্তার মহামহিম সত্তার কথা ঘোষণা করে তদ্রূপ অনিবার্য ভাবে এ কথারও সত্যতা নিরূপন করে, যে মানুষকে কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য দানের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের সেই অভিপ্রেত উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা সাধনের জন্যই ইহ-লৌকিক জীবনের শেষে তার পারলৌকিক জীবনের প্রয়োজন।

بسم الله الرحمن الرحيم

(এক)

এই পুস্তকের প্রথম অংশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা হল, যার সম্বন্ধে মানুষ মাত্রেরই জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। অথচ এই বিষয়টিকে বাদ দিলে ধর্মের আর কোন সার্থকতাই থাকে না বল্লেও চলে। ইহলোকে বসে পরলোকের বর্ণনা দেওয়া অনেকটা জন্মান্ধকে দুধের রং বুঝানোর মত ব্যাপার। মহানবী (দঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি সাগরে আঙ্গুল ডুবিয়ে এনে ঐ আঙ্গুলে লেগে থাকা পানির মধ্যে সমুদ্র দেখার চেষ্টা করে, তাহলে তা যেমন পূর্ণ সমুদ্র দর্শন হবে না তদ্রূপ এই পার্থিব জীবন থেকে পরকাল সম্বন্ধেও সঠিক ধারণা করা সম্ভবপর নয়। তাই মানুষের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে রূপক বর্ণনার মাধ্যমে পরকাল সম্বন্ধে একটা ধারণা সৃষ্টি করা যায় মাত্র। আলোচ্য প্রবন্ধটি আন্তর্জাতিক আদালতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, বিশ্ব বিখ্যাত ধর্ম-বিজ্ঞানী আলহাজ চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খানের Life After Death এর ভাবানুবাদ। শক্তিশালী কলমে রচিত এহেন প্রবন্ধের অনুবাদ সহজসাধ্য নয়। আশা করি এই প্রবন্ধে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের ন্যায় পরকাল সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হবে। অন্যথায় হাদীসের ন্যায় বাইবেলও স্বীকার করে যে 'চক্ষু যাহা দেখে নাই কর্ণ যাহা শুনে নাই এবং মানুষের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই, খোদাতা'লা তাঁহাকে যাহারা প্রেম করে তাহাদের জন্য তাহাই প্রস্তুত করিয়াছেন (যিশ : ৬৪ : ১ করি, ২:৯)।'

(দুই)

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি আরব জগতে ইসলাম প্রচারক আল ফোরকান পত্রিকার সম্পাদক, বিখ্যাত বক্তা ও লেখক মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী কর্তৃক উর্দুতে লিখিত।

ভূমিকা

মৃত্যু সেতো মরণ নয়, মিছে কেন তাতে ভয় ?
মৃত্যু ভয়ে পলে পলে মরার আগেই মরণ হলে
লাভ তাতে কি বেঁচে তোমার, বৃথা জীবন বৃথা সংসার ?
মরণ চির নিদ্রা সম, সকল ক্লান্তির উপশম
ভাঙ্গবে না তা কোলাহলে জাগবে না আর ছলে বলে,
মহা নিদ্রায় যুগ অনন্ত কাটবে জীবন অফুরন্ত।
এ নিদ্রা আর টুটবে নাকো যত কালই ঘুমিয়ে থাকো !
তাইতো বলি ভয় তাতে কি, চালাও স্ফূর্তি পেয়ালা সাকি।
মিথ্যা কেন যমের ভয়ে আয়ু থাকতেই যাব ক্ষয়ে ?
জীবনটাকে ভোগ করে যাই হেসে খেলে যা কিছু পাই।
ধুত্তরি, ফের একি কথা, উঠে মনে যথা তথা ?
মৃত্যু ঘুম একই হলে ভয় কি তাতে যাবে চলে ?
মহা কালের নিদ্রার সাথে থাকে যদি স্বপ্ন তাতে,
কষ্ট, ব্যথা, সাপের ছোবল, অগ্নি, জ্বালা, দুঃখই কেবল,
তাহলে সেই ঘুমন্তকে এসব থেকে বাঁচাবে কে ?
এখন শুধু এই ভাবনা এমন নিদ্রায় কেউ যাবনা
অনিশ্চয়ের চির অন্তে যাবার আগে ভেবে চিন্তে
দেখতে হবে এহেন হতে মুক্তি পাব সে কোন পথে
যে পথ দিয়ে চললে সবাই মুক্তি হবে, পাব রেহাই।
জেগে থেকে পথ না পেলে পাবে না তা মরে গেলে।
সঠিক পথের সন্ধান কর বাঁচার জন্যেই শুধু মর।

আহমদ তৌফিক চৌধুরী
ন্যাশনেল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন

মানুষের ইহলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তি তার মৃত্যুর সাথে ঘটে—এ কথা সত্য কিন্তু মৃত্যু মানেই সমস্ত জীবনের শেষ নয়। আল্লাহতা'লা মানব জীবনকে যে দু'টি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন তার মধ্যে একটি হলো ইহলোক বা এই পৃথিবীর জীবন আর অন্যটি হলো পরলোক বা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। জড় জীবনের অবসানেই পরলোকের জীবনের কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পরলোকের এই জীবন সম্পর্কে ভিন্নতর বর্ণনা রয়েছে। আমরা এই প্রবন্ধে ইসলাম ধর্মের আলোকে পারলৌকিক জীবনের অবস্থা এবং রহস্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

তবে প্রথমেই আমাদের এ সত্যকে স্বীকার করে নিতে হবে যে আমাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ও অনুভূতির সাহায্যে পরলোকের অবস্থা বা তত্ত্ব সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি কখনই সম্ভবপর নয়। পরলোকের অবস্থা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে ঐশীবাণীর সহায়তা একান্ত অপরিহার্য। এ প্রেক্ষিতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উদ্ধৃতি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "পরলোকের অবস্থা এইরূপ যে কোন চক্ষু তা দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ তা শ্রবণ করে নাই এবং বস্তুতঃ কোন মানুষের মন তার বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা করতেও অপারগ।" তাই, এই রহস্যময় জীবন সম্পর্কে

অধিকতর চিন্তা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার অনন্ত অসীম সত্তা ও অপার মহিমা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সহায়তা করতে পারে। তা ছাড়া, ঐশীবাণীমূলে এই পরকাল সম্পর্কে আমাদেরকে যতটুকু অবহিত করা হয়েছে তার ভাষা রূপক এবং প্রতীক হিসাবেই বর্ণিত হয়েছে। তাই, পরলোকের ব্যাপক অবস্থা অনুধাবনের জন্যে আমাদেরকে এই সমস্ত রূপক দৃষ্টান্ত বা সাদৃশ্য সম্পর্কে সর্বাগ্রে ভেবে দেখা উচিত।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে এ পৃথিবীতে মানুষের জীবন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকার একটা দুর্নিবার আকাঙ্খা চিরজাগ্রত থাকে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায় তাকে অনেক সময় বিপর্যস্ত করে ফেললেও মানব হৃদয়ে বেঁচে থাকার এই আকাঙ্ক্ষা—একটি অনন্ত জীবনের সত্যতা সম্পর্কে আভাস দেয়। তাছাড়া, মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তার প্রিয়তম সৃষ্টির আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন বন্দোবস্ত না করে তার হৃদয়ে শুধু 'আশা মরীচিকা' সৃষ্টি করেছেন এ কথা চিন্তা করাও মহান আল্লাহ্ র মর্যাদা বিরোধী। তাই ইহ জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ও কর্মের পূর্ণ প্রতিফল ও প্রতিদানের বিকাশস্থল হিসাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বা পরলোকের ব্যবস্থা করেছেন। এ ধরনের কোন ব্যবস্থা যদি না থাকত তাহলে ইহ জীবনের বিভিন্ন কাজ কর্ম ও মূল্যবোধের সমন্বয় সাধন অর্থহীন হয়ে

পড়ত। মানুষের ধর্ম কর্ম ও ন্যায় নীতির যদি কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব বা হিসাবের পরওয়া না থাকত তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই সে বেহিসাবী উশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যের শিকার হয়ে পড়ত। মানবাত্মার পূর্ণতা বা ইহজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধি অনুভূতি ও কাজ কর্মের পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনা।

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইসলাম তাই অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। কতকগুলি বুনিয়াদী বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা একজন মুসলিমের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কিন্তু পরকালে বিশ্বাস আর খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস একই সাথে সংযুক্ত (কোরআন ৫:৭০)। বস্তুত, পরকালে অবিশ্বাস আর ধর্মে অবিশ্বাসে কোন পার্থক্য নেই। কারণ পরকালের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হলে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বও অস্বীকার করতে হয় এবং সৃষ্টিকর্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিশ্বাস অসঙ্গত ও অসামঞ্জস্য হয়ে পড়ে।

পবিত্র কোরআন পরকাল প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্যের অবতারণা করেছে। সাধারণ মানুষের ধ্যান ধারনার দিকে ইঙ্গিত করে কোরআন বলে: "ইহলোকের জীবন ছাড়া আমাদের অন্য কোন জীবন নেই, পূর্বেও আমাদের কোন জীবন ছিল না। বর্তমানেই আমরা বেঁচে আছি এবং মরব এবং আমরা কখনই পুনরোত্থিত হবোনা" (কোরআন ২৩:৩৮)। অন্যত্র কোরআন

বলে : "মানুষ বলাবলি করে, কি ! আমি যখন মরে যাব তখন আবার সত্য সত্যই কি আমি পুনরুজ্জীবিত হব ? মানুষ কি স্মরণ করেনা যে ইতোপূর্বে নিতান্ত নগণ্য অবস্থা থেকে আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি ?" (কোরআন ১৯:৬৭—৬৮)।

বস্তুতঃ মানুষ তথা সমগ্র বিশ্ব চরাচরই যে এক নিতান্ত তুচ্ছ অবস্থা থেকে সৃষ্ট হয়েছে তা সর্বজনস্বীকৃত। তাই এ কথা নিয়ে বিবাদ করা নিতান্তই স্থূল বুদ্ধির পরিচায়ক যে, যেহেতু বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুভূত হয় যে মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে তার জড়দেহ লয় পেতে থাকে তাই তার সমস্ত অস্তিত্বও বুঝি বিলীন হয়ে গেল। মানুষের সুস্থ বিবেক, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা এ ধরণের সৃষ্টির পরিপন্থী। পরন্তু, পরিবর্তনশীল ও ক্রমবিবর্তনের অনন্ত গতিপথের এক অন্যতম স্তরে মানুষের এই ইহলৌকিক জীবন এই উপলব্ধিকেই বলীয়ান করে যে এই ধারাবাহিকতা সুদূরপ্রসারী। তদুপরি একান্ত 'নাস্তি' অনস্তিত্ব থেকে ক্রম বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষের উৎপত্তি, যেমন এক মহাশক্তিধর সৃষ্টিকর্তার মহামহিম সত্তার কথা ঘোষণা করে তদ্রূপ অনিবার্য ভাবে এ কথারও সত্যতা নিরূপন করে, যে মানুষকে কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য দানের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের সেই অভিপ্রেত উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা সাধনের জন্যই ইহ-লৌকিক জীবনের শেষে তার পারলৌকিক জীবনের প্রয়োজন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবের অধিকাংশ লোক পরলোকের কোন জীবন সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিল না। সে দিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআন বলে, "এবং তারা আশ্চর্যের সাথে বলাবলি করে যে যখন আমরা মৃত্যুর পর শুধুমাত্র হাড় বা অন্যান্য ভগ্নাবশেষে পরিণত হব তখন কি সত্যই আমরা নূতন সৃষ্টিরূপে আবার পুনরোত্থিত হব? বল: তোমরা পাথর, লৌহ বা অন্য যে কোন কঠিনতম পদার্থেই রূপান্তরিত হও না কেন, তোমাদেরকে পুনরোত্থিত করা হবে। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসা করবে: কে আমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন? বল: তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথম বারে সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর তারা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মাথা নেড়ে তোমাকে বলবে: এই ঘটনা কখন সংঘটিত হবে? বল: হয়ত সেদিন খুব সুদূর নয়, মহাপ্রভু যখন তোমাদেরকে আহ্বান করবেন সেই সময়েই এই ঘটনা ঘটবে। তখন তোমার প্রভুর প্রশংসা কীর্তন করবে এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিবে, এবং তোমাদের মনে হবে সে দিনের জন্য তোমাদেরকে অতি অল্প সময়ই অপেক্ষা করতে হয়েছে" (কোরআন ১৭: ৫০—৫৩)।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান প্রশ্নে অনেকেই এই ভ্রান্ত ধারনা পোষণ করে যে, যেহেতু পুনরুত্থান দিনে মানুষ নূতন করে সৃষ্ট হবে সেজন্য তার জড় জীবনের হাড়-গোড়া বা চূর্ণ-বিচূর্ণ ভগ্নাবশেষেরও একত্রীকরণ দরকার,

কেননা নূতন দেহ সৃষ্টির জন্য এ সমস্ত উপাদান কাজে লাগবে। তাদের মনে রাখা উচিত যে পার্থিব প্রয়োজনে যে জড় দেহ তারা পৃথিবীতে লাভ করেছিল তা শুধু ইহজগতের প্রয়োজন উপলক্ষেই সৃষ্টি, পরলোকে এই ধরনের জড় দেহের কোন প্রয়োজন নেই! তাছাড়া, পরকালে পুনরুত্থান বলতে একথা বুঝায় না যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সৃষ্ট সমস্ত মানব মৃত্যুর পরে পুনরায় এই পৃথিবীর বুকেই উত্থিত হবে। আর স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধির বাইরে শুধু তর্কের খাতিরেই যদি ধরে নেওয়া হয় যে সমস্ত মৃত এই পৃথিবীর বুকেই উত্থিত হবে তাহলে এত অসংখ্য মানব গোষ্ঠীর শত কোটির এক অংশকে ধারণ করাওত পৃথিবীর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই দেখা যাচ্ছে, পরকালের জীবনের সাথে পার্থিব জীবনের জড় দেহের কোন মিল নেই এবং পরকালে পুনরুত্থান এই পৃথিবীর বুকেই হবে এই ধারণাও নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে পরকালের স্থান ও কালের যথার্থ স্বরূপ কি? আর জড়দেহ ছাড়া সুখ-দুঃখের অনুভূতিই বা কিরূপে অনুভব করা সম্ভব? এ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যায় পবিত্র কুরআন নিদ্রা এবং স্বপ্নের উল্লেখ করে জানিয়েছে যে মানুষ বাহ্যিকভাবে কোন নির্দিষ্ট স্থান এবং কালে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ না করেও অনেক ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ নিদ্রা এবং স্বপ্নে মানুষ

এ ধরনের বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সুখ ও দুঃখজনিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সময় তাদের শারীরিক অনুভূতির রূপান্তর হলেও প্রতি ক্ষেত্রেই তার দেহ ও আত্মা এক হয়ে এ সমস্ত অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করে। পবিত্র কোরআনের উক্তি : "আল্লাহ্ মৃত এবং ঘুমন্ত লোকদের (যারা মৃত নয়) আত্মা তাঁর নিকট গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেন তাদের আত্মা তাঁর নিকটই রেখে দেন এবং অন্যান্যদের (ঘুমন্ত ব্যক্তি-দের) আত্মাকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদে পুনরায় ফিরিয়ে দেন। চিন্তাশীলদের জন্য এর মধ্যে উৎকৃষ্ট নিদর্শন রাখা হয়েছে"। (কোরআন ৩৯:৪৩) : যাই হোক, পবিত্র কোরআনের পেশকৃত এই দৃষ্টান্তকে বিশ্লেষণ করে আমরা মানুষেরা আত্মা, তার প্রকৃতি ও পরকালের অবস্থা সম্পর্কে মোটামোটি ধারণা করতে পারি। জড়জগতে ঘুমের মধ্যে আমরা যেরূপ সুখ-দুঃখের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করি, পরকালে সুখ-দুঃখের প্রভাবও অনেকটা সেইরূপ।

ঘুমের মধ্যে আমরা অনেকটা দুর্বল অবস্থায় বিছানায় শায়িত থাকি এবং আমাদের স্বপ্নজনিত অভিজ্ঞতাদি আত্মার উপলব্ধিতেই অনুভূত হয়। উপলব্ধির আধিক্য বা তীক্ষ্ণতার উপর ভিত্তি করেই এ সমস্ত অভিজ্ঞতা আমাদের মনে দাগ কাটে। স্বপ্নে এমন অনেক অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানি যাদের রেশ স্বপ্নভঙ্গের পরেও ব্যক্তিজীবনে চিরন্তন স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে বিরাজমান থাকে।

স্বপ্নের অনুরূপ অভিজ্ঞতা অনেক সময় জাগ্রত অবস্থায়ও অনেকে লাভ করে থাকে যাকে সাধারণতঃ জাগ্রত স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ বলা হয়। কাশ্‌ফী অবস্থায় উন্নীত লোকের পক্ষে ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য কোন কাজতো শারীরিক বা মানসিক যাই হোক না কেন করা সম্ভব হয় না। মোট কথা স্বপ্ন এবং কাশফের সময় আমরা এই বস্তুজগতে থেকেও অন্য এক আত্মিক জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে স্বপ্ন বা কাশ্‌ফে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা আর সম্মোহন শক্তি বা বশীকরণের প্রভাবে লব্ধ অভিজ্ঞতা কিছুতেই এক নয়। বশীকরণের প্রভাবে যে, অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ এবং হালে একথা সবাই স্বীকার করেন যে অন্যান্য কর্মদক্ষতা ও কায়দা-কানুনের মত বশীকরণ বিদ্যাও একটা কৌশল মাত্র। যে কেহ আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে চেষ্টা করলে এ বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে।

যাহোক, এত কথা এজন্যই বলা হচ্ছে যে পরকালের অবস্থা ও জীবনধারা অনুধাবনের জন্য আমাদেরকে ইহজীবনের বিভিন্ন অবস্থাকেই পর্যালোচনা করতে হবে। দুনিয়ার জীবন যে প্রক্রিয়ায় আমাদের জন্ম হয়েছে সে দিকে লক্ষ্য করলে পর কালে আমাদের পুনর্জন্ম ও আত্মিক পরিবেশের কিছুটা পরিচয় লাভ করতে পারি। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআন বলেঃ মানুষ কি দেখে না যে আমরা তাকে সামান্য এক ফোঁটা

বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। তবু দেখ, সে সব সময় প্রকাশ্য বাদানুবাদের অবতারণ করে। সে আমাদের সাদৃশ্য উপস্থাপিত করে অথচ নিজের সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে বেখেয়াল। সে বলে: যখন আমাদের হাড়গুলি সম্পূর্ণ ক্ষয়ীভূত হয়ে যাবে তখন কে তাদেরকে জীবন দান করবে? বল: তিনিই যিনি প্রথম তাদেরকে জীবন দান করেছিলেন, এবং তিনি সমস্ত প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষাদির মধ্য হতে আগুন নির্গত করেন এবং দেখ তোমরা তা থেকে আগুন প্রজ্জলিত কর। যিনি এই আকাশ-রাজি এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তার কি অনুরূপ নূতন সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই? নিশ্চয়ই এবং তিনি হচ্ছেন মহা-পরাক্রমশালী স্রষ্টা এবং সর্বজ্ঞ (কোরআন ৩৬: ৭৮-৮২)। কোরআনে বর্ণিত এই আয়াতের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে পার্থিব জীবনে মানুষের নিজ সৃষ্টি প্রসঙ্গ বর্ণনা। বস্তুতঃ মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার মাংসপেশী, হাড়-গোড়, মস্তিষ্ক, রক্ত, তার কার্য্যক্ষমতা, মনোবৃত্তি ইত্যাদি মিলে যে এক অনুপম মানব দেহের সৃষ্টি, এবং তাকে একটি ক্ষুদ্রজগৎ বললে অত্যুক্তি হয় না। তার মূল উপাদানত সেই এক বিন্দু মানব বীজের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশেই বিরাজিত থাকে। মহাপ্রজ্ঞাময় সৃষ্টি-কর্তার অসাধ্য কিছুই নেই। তাঁর মঙ্গল অভিপ্রায়ে তারই সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা মোতাবেক সেই এক বিন্দু তরল মানব বীজই

কালক্রমে এক নূতন সৃষ্টি--মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ করে ;—সেই মানুষ তার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যোগ্যতায় সৃষ্টির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। তবে মানুষের জীবন-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তার আত্মা যার বাহ্যিক আধার হিসাবেই মানব দেহের সৃষ্টি। আত্মার বাহন হিসাবে এই জড় জগতের বিভিন্ন প্রয়োজনে মানবের দেহ একান্ত অপরিহার্য্য। জড় জগতে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, শুধুমাত্র মৃত্যুতেই ইহকালের জন্য দেহ-আত্মার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে থাকে। তাই বলে, মৃত্যুর সাথে সাথে মানব জীবন চিরকালের মত লয়প্রাপ্ত হয় না, বরং বলা চলে এক সীমিত সময় ও স্তরের প্রভাব মুক্ত হয়ে মানবাত্মা এক অনন্ত জীবন পথে ধাবিত হয়। তাই কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার দেহ কিভাবে সমাহিত হলো, তাতে তার (মৃত ব্যক্তির) কিছুই আসে যায় না। মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান, শালীনতাবোধ ও আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদেই মৃতদেহকে সমাহিত করতে হয়। যাই হোক, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা এক নূতন পরিবেশে এক নূতন জীবন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং সেই জীবনের উপযোগী দেহ ধারণ করে। তাই, কোরআনে উল্লেখিত আয়াতে "আমাদের হাড়গুলো সম্পূর্ণ ক্ষয়ীভূত হয়ে যাবার পর পুনরায় তাদেরকে জীবন দান করার" যে কথা আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন তা কার্যতঃ পরকালের পরিবেশে নূতন দেহধারী আত্মার পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গ। "তিনি সমস্ত প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কেই

ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন"—এ কথাতেও যে নূতন ধরনের সৃষ্টি হবে তারই ইঙ্গিত প্রদান করে। বস্তুতঃ যে প্রজ্ঞাময় ও মহা-পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা মানুষকে এক নিতান্ত তুচ্ছ জলীয় পদার্থের ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করে তার জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তার জন্য এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষে মানবাত্মাকে দিয়ে পরকালের উপযোগী আর এক নূতন জীবন ও বিশ্ব সৃষ্টি করা কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য নয়।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে মানবের জন্ম প্রক্রিয়া যে অবস্থা ও বিবর্তনের মধ্যে সম্পাদিত হয় সে দিকে লক্ষ্য করলেও সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতা ও পারলৌকিক জীবনের সাদৃশ্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এ দিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআন বলে: "নিশ্চয় আমরা মানুষকে কর্দমাক্ত মাটির সার পদার্থ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর এক বিন্দু বীজ হিসাবে আমরা তাকে একটি নিরাপদ ভাণ্ডারে স্থাপন করেছি অতঃপর জমাট বাঁধা সেই বীজকে আমরা একটি আকৃতিবিহীন পিণ্ডে রূপান্তরিত অস্থি বা হাড়ের সৃষ্টি করেছি। অতঃপর সেই অস্থিকে আমরা মাংসপেশী দ্বারা আবৃত করেছি। অতঃপর সেই অস্থি ও মাংসপেশী হতে আমরা ভিন্নতর এক সৃষ্টির বিকাশ করেছি। সুতরাং সুনিপুণ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই সমস্ত প্রশংসা। অতঃপর তোমরা প্রত্যেকেই ওফাৎ প্রাপ্ত হবে। তারপর পুনরুত্থান দিবসে তোমরা পুনরায় উত্থিত হবে" (কোরআন

২৩ঃ১৩-১৭)। পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে যেখানে "অতঃপর সেই অস্থি ও মাংস হতে আমরা ভিন্নতর এক সৃষ্টির বিকাশ করেছি বলা হয়েছে-তা হচ্ছে মাতৃগর্ভস্থ মানব সন্তানের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার ধাপের বর্ণনা। বস্তুতঃ মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মাও "ভিন্নতর এক সৃষ্টির বিকাশের" জন্য অন্য-রূপ ভাবে ক্রমবিবর্তনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনের প্রেক্ষিতে কারো মৃত্যুলাভ করার অব্য-বহিত পরের অবস্থাকে তাই তুলনামূলক ভাবে মানব শিশু জন্মলাভের একদম প্রারম্ভিক অবস্থার (যা কোরআনে "এক বিন্দু শুক্র হিসাবে আমরা তাকে একটি নিরাপদ ভাণ্ডারে স্থাপন করেছি" বলে বর্ণিত) প্রতিকৃতি হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এক বিন্দু শুক্র বীজ যেরূপ মাতৃ-জঠরে ক্রম-বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন অবস্থায় উন্নীত হয়ে পরিশেষে মানব শিশু হিসাবে পৃথিবীর বুকে জন্ম লাভ করে তদ্রূপ মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মাও পরকালের উপযোগী পরিবেশে কোন এক বিশেষ স্তরে ক্রমোন্নতি লাভ করে এক নূতন সৃষ্টি হিসাবে পুনরুজ্জীবন প্রাপ্ত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে যেরূপভাবে মানব শিশু জন্মের পূর্বে ও মাতৃ জঠরে জীবন্ত অবস্থায় থাকে তদ্রূপ মানুষের আত্মাও পুনরুত্থানের পূর্বে সচেতন অবস্থায়ই বিরাজ করে। তবে পরকালের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণ উপলব্ধি একমাত্র আত্মার পুনরুজ্জীবন লাভের পরই সম্ভব। পুনরুজ্জীবিত

হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন বিষয়ে আত্মা যে প্রতিবেদন লাভ করবে তা হবে অনেকটা আংশিক ও অসম্পূর্ণ।

কোরআন শরীফের বিভিন্ন বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করলে এই উপলব্ধি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইহলোকে মানুষের আবির্ভাব ও সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে কোরআন বলে : "মানুষ কি মনে করে তাকে বৃথাই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার অবাধ কাজকর্মের কোনই হিসাব নেওয়া হবে না? সে ত মূলতঃ এক বিন্দু নির্গত তরল পদার্থ মাত্র ছিল, অতঃপর তাকে জমাট পিণ্ডে রূপান্তরের মাধ্যমে মহাপ্রভু তার চূড়ান্ত আকার প্রদান করেন, অতঃপর তার থেকে পুরুষ ও নারীর জোড়া সৃষ্টি করা হয়। এমন যে সৃষ্টিকর্তা তার কি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা নেই?" (কোরআন ৭৫:৩৭-৪১)। কোরআনের এই প্রশ্নের একটি মাত্রই যুক্তিযুক্ত জবাব হতে পারে এবং তা হলো—নিশ্চয়ই মহাপ্রজ্ঞাময় ও সর্বশক্তিধর প্রভু যিনি একান্ত 'নাস্তি' অবস্থা থেকে এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করা নিতান্তই সহজ ব্যাপার।

এতসব বাস্তব বর্ণনা ও নীতি উপদেশ থাকা সত্ত্বেও যারা পরকালে অবিশ্বাস করে তারা মূলতঃ এখনো তাদের আত্ম-পরিচয় বা আপন পরিপূর্ণতার রূপ সম্পর্কে সঠিক ভাবে সচেতন নয়। তারা তাদের ন্যায় নীতি ও বিচার ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার করে না। তাদের বিচার শক্তির এই দীনতা তাদেরকে ক্রমশঃ স্থূলবুদ্ধি, দাম্ভিক ও পঙ্গু মানসিকতার শিকারে পরিণত

করে। ফলে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ যে পরকালেও তাদের নূতন জীবন দান করে ধাপে ধাপে উন্নতির ক্রম বিকাশ সাধন করতে পারেন এবং ইহলোকে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ণ করে পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করতে পারেন—সে সম্ভাবনা সম্পর্কে তারা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবেই অবিশ্বাস পোষণ করে। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআন বলে : তোমাদের প্রভু একমাত্র আল্লাহ্! যারা পরকাল সম্পর্কে অবিশ্বাসী তারা মূলতঃ সত্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাদের হৃদয় দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ। তারা যা গোপন করে বা প্রকাশ করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্তা'লা অবশ্যই বিশদভাবে অবগত আছেন। এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্তা'লা অহংকারী ও দাম্ভিক লোকদেরকে ভালবাসেন না। যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় : আল্লাহ্র ঐশীবাণী মূলে যে সমস্ত ব্যাপার অবগত করান হয়েছে সে সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তারা বলে : এগুলোতো অতীত কালের লোকদের উপকথা মাত্র" (কোরআন ১৬:২৩—২৫)

যাহোক, পরকাল সম্পর্কে মানুষের এই অবিশ্বাস যে নিজেকেই পঙ্গু করার নামান্তর সেদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআন বলে : "মানুষ নিজেই নিজের ধ্বংস সাধন করছে। সে কতই না অকৃতজ্ঞ। তিনি (আল্লাহ্) তাকে কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? এক বিন্দু শুক্র বীজ! তিনি (আল্লাহ্) তাকে সৃষ্টি করে তার পূর্ণ অবয়ব প্রদান করেছেন ; অতঃপর তার কর্ম-

ক্ষেত্রকে সহজতর করা হয়েছে। তারপর তিনি (আল্লাহ্) তার মৃত্যু ঘটান এবং তার জন্য একটি নিদিষ্ট 'কবর' প্রদান করেন। অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) যখন ইচ্ছা করবেন তাকে পুনর্জীবিত করা হবে" (কোরআন ৮০ :১৮—২৩)। এখানে যে নিদিষ্ট স্থান বা কবরের কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু মৃতদেহ সমাহিত করার কবর বা সমাধি ক্ষেত্র নয়। কারণ, এ পৃথিবীতে যত লোক মৃত্যুবরণ করে তাদের প্রত্যেকের ভাগ্যে সমাধিস্থ হওয়ার সুযোগ হয় না। অনেকের মৃতদেহকে আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা হয়, কেহ বা বন্য জীবজন্তুর শিকার হয়ে তাদের উদরস্থ হয়, অনেকে হয়ত যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাজেই এখানে যে কবরের কথা বলা হয়েছে তা হলো মৃত্যুর (তা সে যেভাবেই হোক না কেন) পরবর্তী পর্যায় থেকে পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত মানবাত্মার অবস্থিতি ও বিবর্তন-কালীন অবস্থা। পার্থিব জীবনে মানব শিশুর ভ্রূণ তার মাতৃ-জঠরে যেরূপ ক্রম বিকাশ ও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে বাসোপযোগী পূর্ণ মানব দেহ লাভ করে, 'কবরে' মানব আত্মাও পরকালের উপযোগী দেহ লাভের জন্য অনুরূপভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হতে থাকে।

তাহলে এ কথা হয়ত অনেকের মনে প্রশ্নের সৃষ্টি করতে পারে যে 'কবরে' থাকাকালীন মানবাত্মা কি শুধু নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পুনরুত্থানের জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকবে, না কি ইহজীবনে তার

কৃতকর্মের কোন প্রতিফল বা প্রতিদানের ক্রিয়াকেও উপলব্ধি করবে ? এ প্রেক্ষিতে পবিত্র কোরআনের বক্তব্য এই : "যারা ইহকালে তাদের আত্মার প্রতি অবিচার করে তাদেরকে যখন ফেরেস্তাগণ মৃত্যু ঘটায় তখন তারা (মৃত্যু পরবর্তী সময়ে) বিনীতভাবে অত্যন্ত আনুগত্যের সাথে বলবে "আমরাত ইহ-কালে কোনই খারাপ কাজ করি নাই।" কিন্তু আল্লাহ্ নিশ্চিত-ভাবেই তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন। সুতরাং তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নামের দ্বারদেশে প্রবেশ কর। তোমরা সেখানেই অবস্থান করবে। বস্তুতঃ দাম্ভিক ও অহংকারীদের পরিণাম এমনি মন্দই হয়ে থাকে" (কোরআন ১৬:২৯-৩০)।

অনুরূপভাবে সৎকর্মশীল লোকদের বেলায় পবিত্র কোরআন এই ইঙ্গিত করেছে :—"যারা ইহলোকে ভাল কাজ করে তাদের জন্য এই পৃথিবীতেই মঙ্গল রয়েছে, আর তাদের পরকালের জীবনত আরো মঙ্গলময়। সৎকর্মশীলদের পরকালের নিবাস সত্যিই চমৎকার। পবিত্রচেতা লোকদের মৃত্যুর পর আল্লাহ্র ফেরেস্তাগণ বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম ! তোমাদের পবিত্র কর্মের বিনিময়ে আজ তোমরা স্বর্গে প্রবেশ কর" (কোরআন ১৬:৩১-৩৩)। কাজেই একথা সুস্পষ্ট যে 'কবরে' থাকা-কালীন মানুষের আত্মা তার ইহলোকের কৃতকর্মের প্রতিফল আংশিক ভাবে হলেও ভোগ করতে থাকবে। তবে এর রীতি বা বৈশিষ্ট্য পার্থিব জীবনের অনুরূপ না হয়ে পুরোপুরি

আত্মিক বা আধ্যাত্মিক পরিবেশে নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই, ইহলোকে বসে আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা বা সত্তার ভিত্তিমূলে পরকালের অবস্থা সম্পর্কে বিশদ বা সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। আমরা যা করতে পারি তা হলো আমাদের বিচার-বুদ্ধি ও বিবেকের আশ্রয় নিয়ে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে পরকাল সম্পর্কে কাছাকাছি জ্ঞান বা আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এ প্রেক্ষিতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বহুল প্রচলিত হাদীস পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যেখানে তিনি বলেছেন যে ইহকালে বসে পরকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনেও এই উক্তির সমর্থন রয়েছে। কোরআন বলে: "মানুষের ভাল কাজের প্রতিদান হিসাবে পরকালে তার জন্য কিরূপ চক্ষুশীতলকারী স্বর্গীয় আনন্দ জমা রাখা হয়েছে তার স্বরূপ উপলব্ধি করা তার পক্ষে অসম্ভব" (কোরআন ৩২ : ১৮)।

যাহোক, পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এই কথাই আমাদের কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিয়মান হয় যে প্রত্যেক মানুষ ইহলোকে স্বীয় কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে এমন কিছু গুণ বা দোষ অর্জন করে যা তার আত্মার উপরে প্রতিবিম্বিত হয়। পরকালে তার এই কৃতকর্মের প্রতিফলিত অবস্থার অনুরূপ সুখ বা দুঃখের অনুভূতি সে উপলব্ধি করে। সত্য আত্মপ্রয়োগে যে আত্মা এই পৃথিবী থেকে সুস্থ অবস্থায় পরকালে প্রবেশ করে

তার পক্ষে পরকালে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে পূর্ণ উপলব্ধি বা যথাযথ অবস্থা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। আর মিথ্যা অহমিকা ও আত্মপ্রকাশে যে আত্মা দোষিত ও অপূর্ণ অবস্থায় এই পৃথিবী থেকে পরকালে স্থানান্তরিত হয়, তার পক্ষে পরকালের আনন্দ ও সুখ উপভোগ করা সম্ভবত হয়ই না, বরং সেগুলো তার পক্ষে অসহ্য ঠেকে এবং আরো অধিক দুঃখ কষ্টের কারণ হয়ে উঠে। এ ধরণের অনেক ঘটনা আমরা পার্থিব জীবনেও লক্ষ্য করে থাকি। উদাহরণ স্বরূপ, সূর্য কিরণ বা আলোকরশ্মির কথা উল্লেখ করা যায়। পার্থিব জীবনে সূর্য কিরণ যে আমাদের কিরূপ অত্যাবশ্যকীয় বস্তু তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। এই পৃথিবীর রূপ ও সৌন্দর্য উপভোগ বা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কাজকর্মে সূর্যালোকের প্রয়োজন অনিবার্য। কিন্তু যার চক্ষে পীড়া বা ক্ষত রয়েছে সে অসুস্থ চক্ষুর পক্ষে এমনি প্রয়োজনীয় সূর্যালোকও একটি অশান্তির কারণ হয়ে উঠে। সূর্যের সুন্দর আলো তার অসুস্থ চোখ ধারণ করতে পারে না, বরং (অধিক ক্ষতির আশঙ্কায়) সূর্যালোক যাতে তার চক্ষে প্রবেশ না করে সেজন্য সে দ্রুত চক্ষুকে আচ্ছাদিত করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে সুস্থ অবস্থায় একজনের জন্য যা খুব আরামদায়ক ও উপভোগ্য, তা-ই অন্যজনের অসুস্থতার কারণে তার নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক। মানুষের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যেমন, স্বাদ, গন্ধ, শ্রবণ, স্পর্শ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

পরলোকে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় কর্তৃক আরাম-আয়েশ ও দুঃখ-যন্ত্রণা সম্পর্কে উপলব্ধিও তাই পার্থিব জীবনের অনুরূপ। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইহলোকে যাবতীয় কর্মের পশ্চাতেই আমাদের আত্মা বিরাজিত রয়েছে এবং আমাদের কৃতকর্মের তারতম্য অনুযায়ী আমাদের আত্মাও সুস্থ বা অসুস্থ রূপে বিকাশপ্রাপ্ত হচ্ছে। পার্থিব জীবনের শেষে পরলোকে যখন এ সমস্ত আত্মা প্রবেশ লাভ করবে তখন ইহলোকে বিকাশ-প্রাপ্ত পর্যায়ের উপযুক্ততা অনুযায়ী সে তার কৃতকর্মের পূর্ণ পরিণতি এবং পূর্ণ প্রতিফল উপলব্ধি করবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই পবিত্র কোরআন বলে: "আত্মা এবং তার পূর্ণতার কসম তিনি (আল্লাহ্) প্রকাশ করে দিয়েছেন আত্মার জন্য কোনটা অশুভ বা বর্জনীয় আর কোনটাই বা শুভ বা গ্রহণীয়। বস্তুতঃ সে অবশ্যই কৃতকার্য ও উন্নতি লাভ করবে, যে তার আত্মাকে পবিত্র রাখে, আর যে তার আত্মাকে দুষিত করে সে অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে" (কোরআন ৯১ : ৮-১১)। অনুরূপ ধারণা কোরআন শরীফে অন্যরূপেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন, "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি পাপী হিসাবে তার প্রতিপালকের নিকট হাজির হয় তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে না জীবিত না মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করবে" (কোরআন ২০ : ৭৫) এর মানে হচ্ছে এই যে ত্রুটিপূর্ণ আত্মা নিয়ে যে ব্যক্তি পর-লোকের দ্বারে নীত হয় তার পক্ষে পরকালের পরিবেশে

খাপখাওয়ানোর জন্য দীর্ঘ দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করে এই দুর্বিপাকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তার আত্মা অবিনশ্বর এবং তা কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হবে না। আবার পরকালের সুখ উপভোগ করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না যেহেতু তার আত্মা ব্যাধিগ্রস্থ এবং যতক্ষণ না তা পূর্ণ সুস্থ হচ্ছে ততক্ষণ পরকালের আনন্দ সম্ভারকে সে তার নিজস্ব বস্তু বলে গ্রহণ করতে পারবে না।

অন্যদিকে যারা সৎকর্মশীল ও সুস্থ আত্মা নিয়ে পরকালে প্রবেশ করে তাদের পক্ষে পরকালের সুখ-শান্তি ও আনন্দ পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআন বলে: "কিন্তু যে তার প্রতিপালকের নিকট সৎকর্মশীল ও বিশ্বাসী হিসাবে আগমন করে তার জন্য রয়েছে মর্যাদার উচ্চতম স্তর চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান, তার নীচ দিয়ে নহর বয়ে যাচ্ছে; তারা অনন্ত কাল ধরে সেখানে থাকবে। তারা যে নিজেদেরকে পবিত্র করেছিল এটা তারই পুরস্কার" (কোরআন ২০: ৭৬-৭৭)। কাজেই দেখা যাচ্ছে যারা ইহলোকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখে অর্থাৎ ইহকালে তাদের আত্মিক অবস্থার উন্নতি সাধনে ব্রতী হয় তারা পরকালের আশিস ও মঙ্গল যথাযথভাবে উপলব্ধি করবে: ইহকালে তাদের আত্মিক পূর্ণতার উপর ভিত্তি করেই এই উপলব্ধির আতিশয্য বা তীক্ষ্ণতা প্রকাশিত হবে।

পবিত্র কোরআনে এই পুরো ব্যাপারটিকে বিভিন্ন উপমা ও সাদৃশ্য দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে। পার্থিব জীবনের অনেক ত্রুটিপূর্ণ ও অন্যায় কার্যাদি যে আমাদের আত্মিক বিকাশকে সঙ্কুচিত করে পরকালে আত্মাকে পঙ্গুরূপে হাজির করবে তার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে রয়েছে। যেমন, "যে ইহলোকে অন্ধ সে পরলোকেও অন্ধ, বরং সেখানে সে নিজেকে আরো ভ্রান্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হবে" (কোরআন ১৭:৭৩)। এখানে একথা নিশ্চয় বুঝান হয়নি যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে লোক ইহ-লোকে অন্ধ থাকে সে পরলোকে আধ্যাত্মিক অন্ধ হয়ে উঠবে বরং এ অন্ধত্ব উভয় ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব। যে লোক পার্থিব জীবনে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বা বৃত্তির বিকাশ ঘটায়নি সে অতি স্বাভাবিক ভাবেই পরলোকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হবে না। এ দিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআন বলে : "কত নগর ও জনপদকে তার অপরাধের জন্য আমরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছি, কত জলের উৎসকে আমরা অনুর্বর ও কত বিরাট সৌধকে পরিত্যক্ত করেছি ! তারা কি পৃথিবীতে বিচরণ করে না যেন তাদের হৃদয় দিয়ে এ সমস্ত বিষয়ে তারা অনুধাবন করে এবং কর্ণ দিয়ে শ্রবণ করে ? বস্তুতঃ তাদের চোখ বাহ্যত অন্ধ নয় কিন্তু বুকের মধ্যে যে মন রয়েছে তা সত্যিকার ভাবেই অন্ধ" (কোরআন ২২:৪৬—৪৭)। কাজেই একথা সুস্পষ্ট যে কোন সত্যিকার বিষয়কে পর্যবেক্ষণ, বিবেচনা ও মনযোগ দেওয়ার

ব্যর্থতা ক্রমশঃ একজন লোককে আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের দিকে নিয়ে যায়। তাদের কৃতকর্মের পরিণাম সম্পর্কে তারা উদাসীন ও অন্যমনস্ক থাকে এবং পরকালে যখন সত্যি সত্যিই তাদের কর্মের স্বরূপ অবলোকন করে তখন তারা চীৎকার করে বলে: "হায় যদি সত্যই আমরা মনোযোগী হতাম ও আমাদের বিচার শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমরা কিছুতেই জ্বলন্ত নরকের অধিবাসী হতাম না" (কোরআন ৬৭ : ১১)। কোরআনের পেশকৃত এই আয়াত থেকে আমরা এ কথাই বুঝতে পারি যে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ তার পার্থিব জীবনের কাজ কর্ম ও সাধনার মধ্যেই নিহিত। যে লোক তার স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি দিয়ে পার্থিব জীবনে বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করে এবং পরিশেষে সত্য সমাধানে পৌঁছে সে তার আধ্যাত্মিক চক্ষুকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখে। এ ধরনের সুস্থ চক্ষু পরকালের আনন্দ ও সুখকর পরিবেশকে অতি সহজেই আপন করে নিতে পারে এবং পরকালের বিভিন্ন অবস্থাকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

আধ্যাত্মিক অন্ধতা ও বধিরতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের অন্যত্রও উল্লেখ রয়েছে। কোরআন বলে যে আল্লাহ্‌তা লা যাদেরকে বিধিসঙ্গত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন তারা যদি সে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার না করে গোলযোগ ও অশান্তির সৃষ্টি করে তবে তারা পরকালে আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব ও বধিরতায় পীড়িত হবে (কোরআন

৪৭:২৩—২৪)। এটা এ কারণে হয় যে মানুষের স্বার্থপরতা ও বৈষয়িক ব্যাপারে অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ ক্রমশঃ তার সুস্থ মানসিকতাকে নষ্ট করে ফেলে। ফলে নিজ স্বার্থ ও চাহিদার বাইরে কোন সদুপোদেশ বা ভাল কাজ তার কাছে অসহ্য ঠেকে এবং সুস্থ পর্যবেক্ষণ ও বিচারশক্তির মনোভাব তার আর বজায় থাকে না। সে দাম্ভিক ও উদ্ধত স্বভাব বিশিষ্ট হয়ে পড়ে এবং নিজের বিচার বুদ্ধি ও ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে অপরের কোন মন্তব্য ও সমালোচনাকে কিছুতেই সহ্য করে না। এ ধরনের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী তার আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব ও বধিরতা ছাড়া আর কি?

যা হোক, আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের অন্য দিকও রয়েছে। যে ব্যক্তি ঐশী নির্দেশের কোন তোয়াক্কা না রেখে স্বকল্পিত ভাবধারার ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করে সেও তার আধ্যাত্মিক অন্ধত্বকে বরণ করে নেয়। সে তার তীক্ষ্ণ বোধশক্তি বা স্বতন্ত্র মতবাদের জন্য গৌরব বোধ করতে পারে এমনকি এরূপ ধারণাও তার হতে পারে যে বাইরের কোন উপদেশ বা নীতি কথায় তার আদৌ দরকার নেই। কিন্তু ঐশী পরিচালনা ও নির্দেশকে অমান্য করার গোড়ামির ফলে ধীরে ধীরে তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে থাকে। এদিকে ঈঙ্গিত করে পবিত্র কোরআন বলে "পার্থিব জীবনে যে ব্যক্তি আমার স্মরণ

ও নির্দেশকে অমান্য করে, পরকালে তার জীবন হবে ক্লেশপূর্ণ। পুনরুত্থান দিবসে তাকে অন্ধ চোখ নিয়ে উঠান হবে। সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক, পার্থিব জীবনেত আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম তবে আজ কেন আমাকে অন্ধ হিসাবে উঠালে ? আল্লাহ্ বলবেন ? এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (পার্থিব জীবনে) আমার নিদর্শনাবলীকে যখন তোমার নিকট পেশ করা হয়েছিল তখন সে সমস্তকে তুমি অবজ্ঞা করেছিলে। অনুরূপভাবে আজকে তোমাকেও বর্জন করা হল" (কোরআন ২০:১২৫—১২৭)। ইহজীবনের বিভিন্ন কর্মসংক্রান্ত আলোচনায় আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে পার্থিব জীবনে সমস্ত কাজ কর্মের মাঝে আমাদের আত্মা সূক্ষ্মভাবে বিজরিত থাকে এবং আমাদের সমস্ত কাজ কর্ম এই আত্মার উপর একটা প্রভাব বা চাপের সৃষ্টি করে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত পর্যালোচনা করলে আমরা এই কথার সমর্থন পাই। এ সমস্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকে পরলোকের যে পরিচয় আমরা লাভ করি তাহলো এই যে পার্থিব জীবনের শেষে মৃত্যুর দ্বার দিয়া আমাদের আত্মা পরলোকের পথে পারি দিবে। ইহজীবনে সম্পাদিত বিভিন্ন কৃতকর্মের ছাপযুক্ত আত্মা তখন আপন আপন কর্মানুযায়ী প্রতিফল ভোগ করতে থাকবে। তাছাড়া পার্থিব জীবনের সমস্ত কাজ ও তার পরিণামকে একত্রিত করে প্রত্যেক ব্যক্তির "আমল নামাকে" সেদিন প্রত্যেকের সামনে উপস্থাপিত করা হবে।

একটি খোলা বই এর মত সেই "আমল নামার" পূর্ণ বিবরণ তখন প্রত্যেককে পাঠ করতে বলা হবে এবং স্বীয় কৃতকর্মের ধারা অনুযায়ী প্রত্যেকের গতিপথ সেদিন পরিচালিত হবে। একদিকে পাথিব জীবনে তার কৃতকর্মের পুরো বিবরণ যেমন তার নিকট উদ্ভাসিত করা হবে, তদ্রূপ তার কর্মের তারতম্য অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তির ফলও তার নিকট স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করা হবে। কোরআন বলে, "প্রত্যেক ব্যক্তির কাজের বিবরণ তার ঘাড়ের সাথেই সংযুক্ত, এবং পুনরুত্থান দিবসে আমরা তার কর্মসংক্রান্ত একটি খোলা বই তার নিকট উপস্থিত করব। তাকে বলা হবে, তোমার বই থেকে পাঠ কর; তোমার কৃতকর্মের গণনাকারী হিসাবে আজ তোমার আত্মাই যথেষ্ট! বস্তুতঃ পাথিব জীবনে যে ব্যক্তি পুণ্য শিক্ষা ও সঠিক পথে চলেছে সে তার আত্মার মঙ্গল সাধন করেছে; আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথে চলেছে সে তার আত্মাকে কলুষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আজ কোন বোঝা বহনকারীই নিজ ব্যতীত অপরের বোঝা বহন করবে না" (কোরআন ১৭:১৪—১৬)।

যা হোক, একথাও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে পাথিব জীবনে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কাজ কর্মের পূর্ণ পরিণতি এবং পূর্ণ প্রতিফল ভোগের স্তর হচ্ছে পরলোক তাই মানুষের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিসমূহের যে অবস্থায় আত্মা পরলোক গমন করবে সেই অবস্থা বা পর্যায়ের অনুরূপ অভিজ্ঞতা দিয়েই

পরকালের নূতন জীবন সে শুরু করবে। পরকালের সেই নূতন অবস্থার সাথে তার আত্মার প্রতিক্রিয়া থেকেই ইহকালে তার কৃতকর্মের সুস্পষ্ট রূপ এক অখণ্ডনীয় সত্য হিসাবে ধরা পড়বে। তাই যেসব চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা অথবা ত্বক ইহলোক থেকে আধ্যাত্মিক পীড়িত অবস্থায় পরলোকে প্রবেশ করবে তারা পরলোকের পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপখাওয়াতে পারবে না। পরলোকের পরিবেশের সাথে এ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়া থেকেই সহজে বুঝে নেওয়া যাবে ইহলোকে তাদের দ্বারা কি ধরনের অন্যায় কার্য সম্পাদিত হয়েছিল। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআন বলে: যখন তারা তাদের কৃত-কর্মের পরিণাম স্বরূপ জাহান্নামের আজাবে নিপতিত হবে, তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক ইহজীবনে তাদের অপব্যবহারের জন্য তার বিরুদ্ধেই সাক্ষী পেশ করবে। তারা তাদের ত্বককে লক্ষ্য করে বলবে: আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিচ্ছ? তারা বলবে আজ অন্যান্যদের মত আমাদেরকেও আল্লাহ্‌তা'লা কথা বলতে আজ্ঞা দিয়েছেন।" তিনিই (আল্লাহ্‌) তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন এবং আজ পুনরায় তার নিকটেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তোমরা এ কথা কখনো উপলব্ধি কর নাই যে তোমাদের কর্ণ, চক্ষু বা ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে; তা ছাড়া তোমরা ভেবেছিলে যে তোমরা যা করছ তার অধিকাংশ আল্লাহ অবগত নন। তোমাদের

প্রতিপালক সম্পর্কে এ ধরনের ধারনাই তোমাদের ধ্বংসের কারণ। তাই আজ তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত (কোরআন ৪১ : ২১-২৪)।

উপরে বর্ণিত আয়াতের প্রেক্ষিতে এ কথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে সত্য প্রাপ্তি ও সত্য হতে বিচ্যুতির প্রতিরোধক পথের সন্ধান করাই ইহজীবনে মানুষের কর্তব্য। এ ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কোরআন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং আমাদের সমস্ত কাজ কর্মই যে আল্লার গোচরীভূত এই চেতনা আমাদেরকে অত্যন্ত ফলপ্রসুভাবে খারাপ কাজ হতে বিরত এবং ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। শুধু তাই নয়, যারা সত্যিকারভাবে জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে এমনিভাবে প্রত্যক্ষ করে চলে তারা তাদের আধ্যাত্মিক বৃত্তিসমূহের যথাযথ ব্যবহারের ফলে পরকালে স্বর্গীয় আনন্দ ও সুষমা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে সক্ষম হয়। তারা আধ্যাত্মিক সুস্থ দেহের অধিকারী হওয়ায় পরলোকের অবস্থা বা অভিজ্ঞতার সাথে অতি সহজেই খাপখাইয়ে নিতে পারে। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআন বলে : 'যারা সত্যিকারভাবে আল্লাকে স্মরণ ও ভয় করে তাদেরকে দলে দলে স্বর্গোদ্যানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। স্বর্গের সন্নিকটবর্তী হলে এর রক্ষীরা তাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিবে এবং

বলবে "তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা (প্রতিপালকের) আশিষ প্রাপ্ত, কাজেই তোমরা এর ভিতরে প্রবেশ কর এবং সেখানে অবস্থান কর" তারা বলবে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে দেয়া তার ওয়াদা পরিপূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই বিরাট অঞ্চলের উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা এই বিরাট স্বর্গোদ্যানের যেখানে খুশী সেখানেই অবস্থান করতে পারি"। সৎকর্মশীল লোকদের পুরস্কার সত্যিই কত মহান! (কোরআন ৩৯ : ৭৪-৭৫)।

কোরআনের উপরোক্ত দুটো আয়াতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের দুটো পৃথক অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এই পৃথক অবস্থা দুটোর নামই হচ্ছে বেহেস্ত ও দোযখ। এ কথা আমাদের অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যে বেহেস্ত ও দোযখ কোন পৃথক বা আলাদা অঞ্চল নয়। ইহজীবনে আমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ পরকালে আমাদেরকে যে সুখ ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হবে তার পাশাপাশি দুটো অবস্থার নামই হলো বেহেস্ত ও দোযখ। বেহেস্ত সম্পর্কে কোরআনে যে বর্ণনা রয়েছে তাতে দেখা যায় যে বেহেস্তের বিস্তৃতি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী জুড়েই পরিব্যাপ্ত (কোরআন ৫৭:২২ ও কোরআন ৩:১৩৩)। একজন সাহাবী একদা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন, "বেহেস্তের আয়তনই যদি এত বিরাট হয় যে তা সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী

ব্যাপী বিস্তৃত, তা হলে দোযখ কোথায় ?" রসূল করীম (সাঃ) এর প্রতিউত্তরে অন্য একটি প্রশ্নের অবতারণা করে তাকে বলেন "রাত্রির বর্তমানে দিনের অস্তিত্ব কোথায় ?' বস্তুতঃ আলোর অনুপস্থিতির নামই হলো রাত্রি। পার্থিব জীবনে আলোরূপ পূণ্য কাজ ও আদর্শকে পরিহার করে যারা নিজেদের খেয়াল খুশীমত পাপ ও ত্রুটিপূর্ণ কাজে নিজেদের আত্মাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, তাদের পক্ষে পরলোকের অপরিমেয় আনন্দ ও সুখ উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় না। তাই, তাদের সুস্থতা বিধানের জন্য দুনিয়ার চিকিৎসাস্থল "হাসপাতালের" অনুরূপ পরকালে 'দোযখ' বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে করে পরিণামে ব্যধিমুক্ত হয়ে প্রত্যেক আত্মাই পরকালের সুখ ও শান্তির অধিকারী হতে পারে। পরকালে ব্যাধিগ্রস্থ আত্মার এই চিকিৎসা কালীন অবস্থার নামই হলো দোযখ। এখানে আর একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন, আমরা পরকাল সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে কথায় বা লেখায় প্রতিনিয়ত আলাপ আলোচনা করলে সে ব্যাপারে আমাদের মনে একটা বাহ্যিক ছবি বা রূপ জন্ম নেয়, যদিও তার যথার্থ স্বরূপ আদৌ সে রকম না হতে পারে। তা ছাড়া, মানুষ যে ভাষায় অভ্যস্ত সে ভাষায় কিছু বলা হলেই তা তার বোধগম্য হয়। তাই পরকালের বিভিন্ন বিষয় বর্ণনায় এমন ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করা হয়, যা ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া হয় যা মানুষের বোধগম্য এবং যার ফলে তার মন বিষয় বস্তুটি

সম্পর্কে মোটামোটি ধারণা করতে পারে। পরকাল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা হুবহু বর্ণনা যে ইহলোকে বসে করা মানুষের সাধ্যাতীত সে সম্পর্কে অবশ্য আমাদের কারো দ্বিরুক্তি নেই।

যাই হোক, পরকাল সম্পর্কে কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনাকে যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে এ কথা অতি স্পষ্ট ভাবেই প্রতিয়মান হয় যে ইহকালে মানুষের ধ্যান ধারণা অভিপ্রায় ও কর্মকেই প্রতীকরূপে ব্যবহার করে পরকালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আর পরকাল যে ইহকালের কর্ম যজ্ঞের পূর্ণ পরিণতি বা প্রতিফল লাভ করারই একটি অনুপম ব্যবস্থা তাও আমরা পূর্বে বহুবার উল্লেখ করেছি। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআন বলে : "যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে তাদের জন্য (পরকালে) রয়েছে উদ্যান যার নীচ দিয়ে নহর বয়ে যাচ্ছে। যখন তাদেরকে সেখান হতে কোন ফল খেতে দেওয়া হবে তারা বলবে : পূর্বেও (ইহকালে) আমাদেরকে এমনি ফল দেওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃ তাদেরকে প্রদত্ত আশিসরাজি হবে সাদৃশ্য পূর্ণ (কোরআন ২:২৬)। কোরআনের এই আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই যে পরকালে সৎকর্মশীল লোকদেরকে যখন বেহেস্তের ফল খেতে দেওয়া হবে, তখন ইহকালেও অনুরূপ ফল তারা কম বেশী ভোগ করেছে বলে মন্তব্য করবে। ইহকালে ভোগ করা তাদের এই ফলগুলো হলো সৎকর্ম ও পুণ্যময়জীবনের আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি যার সাথে

পরকালে প্রদত্ত ফলরাজির সাদৃশ্য রয়েছে। তা ছাড়া পরকালের বর্ণনায় এ কথারও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় যে সৎকর্মশীল লোকেরা সেখানে তাদের ইচ্ছা ও পসন্দানুযায়ী ফল ও মাংস ভোগ করবে। সৎকর্মশীলদের পসন্দকৃত এই মাংস "যে পাখীর মাংস হবে" তার উল্লেখও কোরআনের অন্যত্র রয়েছে (কোরআন ৫৬:২১—২২)। আবার কোরআনের পরিভাষায় 'পাখী' বলতে যে মানুষের কাজকর্ম ও আচরণকে বুঝান হয় তার ইঙ্গিতও আমরা কোরআন থেকে পাই (কোরআন ১৭:১৪)। তাই এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে পরকালে সৎকর্মশীলদের পুরস্কার স্বরূপ যে ফল ও মাংসের উল্লেখ রয়েছে তা মূলতঃ ইহকালে এ সমস্ত লোকের পুণ্য কর্মের প্রতিফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

সৎকর্মশীলদের জন্য পরকালে স্বর্গবাস ও তার আনন্দরাজি যে উপমা বা সাদৃশ্য হিসাবেই আমাদের কাছে পেশ করা হয়েছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কোরআন থেকেই আমরা পাই। যেমনঃ সৎকর্মশীলদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের সাদৃশ্য হচ্ছে এইঃ সেখানে এমন জলের ধারা রয়েছে যা কখনো দুষিত হয় না, এবং এমন দুধের নদী রয়েছে যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হয় না। আর রয়েছে শরাবের নহর, যারা সেই শরাব পান করবে তারা হবে পরিতৃপ্ত। এবং বিশুদ্ধ মধুর প্রস্রবন। এর মধ্যে তারা সমস্ত প্রকার ফল ভোগ করবে, আর তাদের

প্রতিপালক প্রভুর ক্ষমা ও আশিস তারা প্রাপ্ত হবে (কোরআন ৪৭:১৬)। লক্ষ্য করার বিষয় যে, যে সৎকর্মশীলদের স্বর্গবাস সম্পর্কিত কোরআনের এই আয়াতটি শুরুতেই পরকালের প্রতিশ্রুত বস্তুসমূহের সাদৃশ্য বা উপমা বলে প্রকাশ করেছে। তাছাড়া উদ্ধৃত নহর ও তাদের আধারস্থ বস্তুরাজি যে বিশেষ কতগুলো আধ্যাত্মিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যকেই বুঝিয়েছে বিভিন্ন রূপক ও তুলনামূলক শব্দকে পর্যালোচনা করলে সে ব্যাপারে আমাদের পরিস্কার ধারণা মিলে। উদাহরণ স্বরূপ পানির ধারা দিয়ে সাধারণতঃ সর্বপ্রকার উন্নতিকে বুঝান হয়, ঐশী গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করাকে দুধের প্রতীকরূপে প্রকাশ করা হয়। আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের প্রেম ও আকর্ষণকে শরাব বা মদের নেশার অনুরূপ ভাবে বুঝান হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপার উপমা মধুর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। তবে এ প্রেক্ষিতে একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পরকালের উল্লিখিত শরাব কিছুতেই ইহলোকের নেশা প্রদানকারী মদ বা সুরা নয় (যাকে পানীয় হিসারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে)। পরকালে শরাবের বর্ণনা আমরা পবিত্র কোরআন হতে যা পাই তা হচ্ছে এই : দীপ্তিময় ও অতি শুভ্র পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু, যার মধ্যে না আছে নেশাগ্রস্ত করার কোন উপকরণ, না আছে পরিশ্রান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা (কোরআন ৩৭:৪৭—৪৮)। পুনরায় "একটি বড় পানপাত্র ও প্রস্রবণ নিঃসৃত

এই পবিত্র পানীয়, যা পানকারী সমস্ত প্রকার বিহ্বলতা যন্ত্রণা ও উন্মত্ততা হতে মুক্ত (কোরআন ৫৬:১৯, ২০)। কাজেই দেখা যাচ্ছে শুধু নামের দিক থেকে মিল থাকলেও ইহলোক ও পরলোকের বস্তুরাজি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এ নিয়ে আমাদের সংশয়ের আর কোন কারণ থাকা উচিত নয়।

পরলোকে সৎকর্মশীলদের পুরস্কারের প্রকৃতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করে যা দেখা গেল তাতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে পরলোকের জীবন ধারা ইহলোকের প্রতিফলন হলেও পরলোকের পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একান্তই আধ্যাত্মিক। পরলোকে পাপী লোকদের দুঃখ-যন্ত্রণা ও শাস্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করলেও এ সত্য প্রতিভাত হয়ে উঠে। যেমন পরলোকে পাপী লোকদের দুঃখ যন্ত্রণাকে পবিত্র কোরআনে "আল্লাহ্‌তালার প্রজ্বলিত অগ্নি" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই প্রজ্বলিত অগ্নি ক্রমশঃ মানুষের অন্তকরণকে জ্বালিয়ে দেয় বলেও বর্ণনা আছে। এর থেকেও এ কথা সুস্পষ্ট যে নরকের অগ্নি মূলতঃ পাপীলোকদের হৃদয়েই অবস্থান করে এবং পরকালের শাস্তি মূলতঃ ওই সমস্ত লোকদের ইহজীবনের অন্যায় কার্যাদির প্রতিক্রিয়া মাত্র। পরলোকে ঐশী বিধানের আঙ্গিকে ইহজীবনের অন্যায় "আমলসমূহই" প্রজ্বলিত অগ্নির রূপে প্রতিয়মান হয় এবং তা ধীরে ধীরে অন্যায়কারীর অন্তরের উপর অশান্তির প্রদাহ সৃষ্টি করে (কোরআন ১০৪ : ৭, ৮)।

দোযখের বর্ণনায় কোরআন বলে যে এর সাতটি দরজা রয়েছে (কোরআন ১৫ : ৪৫)। আমরা যেরূপ পূর্বেই বলেছি যে দোযখ কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল বা বাহ্যিক পরিবেশ নয়, তাই এক্ষেত্রে দোযখের দরজা বলতে দোযখ বাসের বিভিন্ন কারণ ও এর মধ্যস্থিত বিভিন্ন অবস্থাকেই বুঝতে হবে। তা ছাড়া আরবী ভাষায় 'সাত' এবং 'সত্তর' এই সংখ্যাদ্বয় বহু বা অসংখ্য অবস্থা বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবুও উক্ত 'সাত' যদি এ প্রেক্ষিতে কোন নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর সম্ভাব্য তাৎপর্য এই যে দোযখ সম্পর্কিত দুঃখ কষ্টের অনুভূতি আত্মা যে যে ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করবে তার সংখ্যা সাত। ইন্দ্রিয়-গুলি হচ্ছে : দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রান আস্বাদন, স্পর্শ, ঠাণ্ডা ও তাপের অনুভূতি এবং ক্লান্তি বা শ্রান্তির উপলব্ধি। কোরানের বিভিন্ন জায়গায় পরকালের আজাব সম্পর্কিত যে বর্ণনা রয়েছে তাতে আমরা উল্লিখিত ইন্দ্রিয়সমূহের এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের শাস্তিকালিন অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারি। তা ছাড়া, ইহ-কালে আল্লার শক্তি ও সামর্থ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যে সমস্ত ব্যধিগ্রস্ত আত্মা পরকালে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে তারা তখন তাদের ভুল বুঝতে পারবে ও আল্লার শক্তি সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি করবে বলেও কোরআন থেকে আমরা জানতে পাই। যেমন, 'যখন পাপী লোকেরা তাদের নির্ধারিত আযাব অবলোকন করবে তখন তারা উপলব্ধি করবে যে আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও

শক্তিশালী এবং তিনি শাস্তি প্রদানেও অত্যন্ত কঠোর (কোরআন ২ : ১৬৬)। কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা জাহান্নামের অবস্থা ও শাস্তির ধারা সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত হতে পারি। যেমন, এ সমস্ত লোক অনেক দূর থেকেই জাহান্নামের প্রচণ্ড গর্জন ধ্বনি শুনতে পাবে (কোরআন ২৫ : ১৩) তাদের পানীয় হবে ফুটন্ত জল, তারা এতে চুমুক দিবে কিন্তু সহজে গলধঃকরণ করতে পারবে না (কোরআন ১৪ : ১৭-১৮) তারা না ঘুমাতে পারবে, না তৃষ্ণাকে নিবারণ করতে পারবে কারণ তাদের পানীয় হবে উত্তপ্ত ও অত্যন্ত দুর্গন্ধময় (কোরআন ৭৮ : ২৫-২৬)। তাদের খাদ্য হবে শুকনো, তিক্ত ও কণ্টকময় তৃণ বিশেষ, এতে তাদের পুষ্টিও হবে না বা ক্ষুধাও মিটবে না (কোরআন ৮৮ : ৭-৮)। নরকাগ্নি তাদের বিছানা ও আবরণ স্বরূপ হবে যাতে করে এর যথার্থ যন্ত্রণা তারা স্পর্শ দ্বারা অনুভব করে (কোরআন ৭ : ৪২)। তাদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় যখন একটি অবদ্ধ জায়গায় নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তাদের মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু তারা মৃত্যু প্রাপ্ত হবে না (কোরআন ২৫:১৪)। তাদের পানীয় হবে খুবই উত্তপ্ত বা খুবই শীতল যাকে উদরস্থ করা তাদের পক্ষে খুব কষ্টকর হবে। এ ধরণের আরো অনেক শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে (কোরআন ৩০ : ৫৮-৫৯)। তাদের হাত, পা ও গলায় লোহার বেড়ী থাকবে যাতে করে তাদেরকে দৃঢ়ভাবে নরকের যন্ত্রণায়

স্থাপন করা যায় (কোরআন ৭৬ : ৫)। কোন কোন মুখমণ্ডলকে সেদিন অবনত ক্লান্ত ও দুঃখিত করা হবে (কোরআন ৮৮ : ৩-৪)। কিন্তু পাপীলোকদের জন্য সবচেয়ে দুঃখপ্রদ ঘটনা হবে এই যে সেদিন আল্লাহতালা তাদের সাথে কথা বলবেন না। তা দের দিকে ফিরে তাকাবেন না বা তাদেরকে পরিশোধিত করবেন না (কোরআন ২ : ১৭৫ ও কোরআন ৩ : ৭৭)। আল্লার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার এই অভিজ্ঞতাই হবে সেদিন তাদের জন্য সবচেয়ে মর্মান্তিক ও পীড়াদায়ক ব্যাপার। তখন তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে পার্থিব জীবনে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে তারা কি ভুলই না করেছে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লার প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের জীবনে আল্লাহর বিভিন্ন গুনরাজির বিকাশ ঘটানো, তার নির্দেশিত পথে চলা ও তার এবাদত করা (কোরআন ৫১ : ৫৭)।

অপর পক্ষে সৎকর্মশীল লোকদের অবস্থা হবে পাপীলোক-দের সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বর্গের অনুপম পরিবেশ ও বিচিত্র আয়োজনপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি তাদের জন্য খুবই মনোহর ও গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হবে। তাদের মুখমণ্ডলসমূহে আনন্দের অভিব্যক্তি বিচ্ছুরিত হবে এবং তারা ইহজীবনে কৃতকর্মসমূহের পরিণাম দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হবে (কোরআন : ৮৮:৯-১০)। তারা সেখানে কোন অনাবশ্যক বা অনর্থক কথা-বার্তা শুনতে পাবে না

(কোরআন ৭৮:৩৬)। কোন দাম্ভিক বা নিস্ফল আলোচনা সেখানে নেই, বরং রয়েছে শুধু 'শান্তি' (কোরআন : ১৯: ৬৩) তাদেরকে 'শান্তির'র অভিবাদন সহ স্বাগত জানান হবে (কোরআন : ২৫:৭৬)। যেমন, 'তারা সেখানে কোন নিস্ফল বা অপবিত্র কথাবার্তা শুনতে পাবে না, শুধুমাত্র শান্তির স্বাগত বাণী "সালাম, সালাম" (কোরআন ৫৬:২৭)। স্বর্গের ফেরেস্তাগণ তাদেরকে এই বলে অভিবাদন করবে 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা আনন্দপূর্ণ অবস্থায় উন্নীত হয়েছ, কাজেই বেহেস্তে প্রবেশ কর এবং চিরকাল সেখানে অবস্থান কর (কোরআন ৩৯ : ৭৪)। বেহেস্তে তারা গরম বা ঠাণ্ডার প্রতিকুল প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে (কোরআন : ৭৬:১৪)। সেখানে আল্লাহতা'লা তাদেরকে এক পবিত্র পানীয়ের বন্দোবস্ত করবেন (কোরআন ৭৬ : ২২)। তারা সুশোভিত উদ্যান ও প্রস্রবনের ভিতর বাস করবে (কোরআন ১৫:৪৬)। ক্লান্তি বা অবসাদ তাদেরকে স্পর্শ করবেনা (কোরআন ১৫:৪৯)। তারা সেখানে পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের সৌরভে পরিতৃপ্ত হবে (কোরআন ৫৬ : ৯০)। তারা সর্বক্ষণ তীব্র আনন্দের মধ্যে বসবাস করবে (কোরআন ৭৬:১২)। তাদের মুখমণ্ডল থেকে স্বর্গীয়-সুখের সজীবতা প্রকাশ পাবে এবং কস্তুরী আচ্ছাদিত এক পবিত্র পানীয় পান করতে দেওয়া হবে (কোরআন ৮৩:২৫-২৭)। তারা স্বর্গীয় আনন্দের এক বিস্তীর্ণ রাজ্যমধ্যে অবস্থান করবে এবং বলবে : "সমস্ত প্রশংসাই

আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে দেয় তার ওয়াদা পরিপূর্ণ করেছেন, এবং বসবাসের জন্য আমাদেরকে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা বেহেস্তের যেখানে খুশী সেখানেই অবস্থান করতে পারি (কোরআন ৩৯:৭৫)।

যা হোক, সৎকর্মশীলদের চূড়ান্ত সাফল্য বা বিজয় হবে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা বা সে সম্পর্কে স্পষ্ট উপলব্ধি (কোরআন ৩:১৬ ও কোরআন ৫৭:২১)। যেমন, "আল্লাহ তাদেরকে তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির শুভ সংবাদ দিবেন" (কোরআন ৯:২১)। "যারা সৎকর্মশীল, পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে আল্লাহ তাদেরকে এই ওয়াদা করেছেন যে তাদের জন্য রয়েছে পরকালে উদ্যান, যার নীচ দিয়ে নহর বয়ে যাচ্ছে, সেখানে তারা অবস্থান করবে। আর সে মনোরম স্থানে তারা অনন্তকাল ধরে সর্বোৎকৃষ্ট আশিস ও সাফল্য হিসাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে থাকবে (কোরআন ৯:৭২) আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট" (কোরআন ৯:১০০)।

এখন স্বভাবতই এ ব্যাপারে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে পরকালে আমাদের সুখ ও দুঃখজনক অনুভূতিসমূহ কি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে, না কি এরও একটা শেষ অবস্থা রয়েছে? কোরআনের বিভিন্ন আয়াত পর্যালোচনা করলে আমরা এ কথারও জবাব দেখতে পাই। আমরা দেখি যে পর-

কালের সুখ ও আনন্দধারা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে এবং ক্রমশই এই অনুভূতি তীব্রতর আকারে প্রকাশিত হবে। অপর-পক্ষে নরকের দুঃখ ও যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর আর অবশিষ্ট থাকবে না। তখন ব্যাধিমুক্ত সকল আত্মাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁর অপার করুণা ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে পর লোকের অনুপম সুখ ও শান্তির অধিকারী হবে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে এই পৃথিবীতে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আল্লাহ্‌তা'লার রূপের বিকাশ ঘটানো, তার নির্দেশিত পথে চলা ও তাঁর এবাদত করাই হলো আমাদেরকে সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য (কোরআন ৫১ : ৫৭)। এই ঐশী উদ্দেশ্য পরকালে প্রত্যেকটি জীবনের মাঝেই দীপ্তিমান হবে। আল্লাহতা'লা বলেন : "যাকে খুশী তাকে আমি শাস্তি দিব, কিন্তু আমার অনুগ্রহ সব কিছুকে ঘিরে রয়েছে" (কোরআন ৭ : ১৫৭)। বস্তুত, খোদার অনু-গ্রহকে পূর্ণভাবে লাভ করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি (কোরআন ১১ : ১২০)। যখন দোযখের বিভিন্ন যন্ত্রণা ও দুঃখ কষ্টের মাধ্যমে পাপরূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত আত্মাসমূহের চিকিৎসা শেষ হবে তখন অসীম করুণাময় আল্লাহতা'লার সেই ঐশী অনুগ্রহে প্রত্যেকটি পাপাত্মাই দোযখের যন্ত্রণাময় পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে পরকালের সুখময় উপকরণসমূহের আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হবে।

এ ব্যাপারে হযরত (দঃ)-এর বর্ণিত হাদিসের প্রসঙ্গও স্মরণ

করা যায়। তিনি বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে, যখন সমস্ত দোযখ খালি হয়ে যাবে এবং খোদার অনুগ্রহে মৃদুমন্দ সমীরণ দোযখের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে।" যা হোক পরকালের স্থিতিকাল কতদিন স্থায়ী হবে তা একমাত্র আল্লাহতালাই অবগত। তবে এটা সচরাচর দেখা যায় যে আমাদের সুখ ও আনন্দের মুহূর্তগুলো অতি দ্রুত শেষ হয়ে যায় বলে প্রতীয়মান হয়, অথচ দুঃখ ও ক্লেশের সময়কে মনে হয় অনেক দীর্ঘ ও বিলম্বিত। তাই পরকালের দুঃখ যন্ত্রণাও অনেক দীর্ঘ ও অশেষ বলে মনে হবে। তাছাড়া ঐশী বিধানের আঙ্গিকে এ সমস্ত দুঃখ ক্লেশ অত্যন্ত গভীর ও তীব্রভাবে অনুভূত হবে এবং এর থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোন বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে না। কিন্তু সময় অনন্ত, তাই পর্যায়ক্রমে এই শাস্তিকালীন অবস্থাকে পরিবর্তন করে এক সময় বিলুপ্তি করা হবে। আর যেহেতু এই শাস্তি ও দুঃখময় অভিব্যক্তি পাপী লোকদের সংশোধন নিমিত্তই পরিচালিত হবে তাই প্রত্যেক পর্যায়ের পরবর্তী অবস্থা তার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে উন্নততর হবে। কিন্তু যে পর্যন্ত না ব্যাধিগ্রস্থ আত্মাসমূহ পুরোপুরিভাবে রোগমুক্ত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার সার্বিক প্রতিক্রিয়া দুঃখময়ই থেকে যাবে। এ প্রেক্ষিতে কোরআন বলে, পাপী লোকের শাস্তির মেয়াদ কোনদিন শেষ হবে না বলে মনে হবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এরও একদিন শেষ হবে (কোরআন ১১ : ১০৮)। অপরপক্ষে পরকালের

সুখ ও আনন্দের ক্ষণও আল্লাহর ইচ্ছাধীন, কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছাকে ঘোষণা করা হয়েছে আর তা হলো "এমন আশিস যাকে কোন দিন ব্যাহত করা হবে না" (কোরআন ১১ : ১০৯)। আবার পুণ্যশীলদের পুরস্কার "কোন দিন শেষ হবে না" (কোরআন ৯৫ : ৭)।

কাজেই দেখা যাচ্ছে পরকালে পাপী ও পুণ্যশীল নির্বিশেষে সকলের জন্য অনন্ত উন্নতির বন্দোবস্ত রয়েছে। যারা ব্যাধি-গ্রস্ত আত্মা নিয়ে পরকালে প্রবেশ করবে তারা শাস্তি প্রাপ্ত হবে ঠিকই, কিন্তু এ শাস্তি তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়, বরং ব্যাধিগ্রস্ত আত্মার চিকিৎসা ও আরোগ্যপূর্ব দুঃখ-যন্ত্রণা মাত্র। এর ফলে আত্মা তার পূর্ণতা ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ করবে এবং পরকালের অপরিমেয় আনন্দ সম্ভার উপভোগ করতে সক্ষম হবে। আর যারা পুণ্যশীল তারা সব সময় খোদার 'আলো'র জন্য প্রার্থনা করবে এবং এই আলো যাতে আরো পূর্ণভাবে তাদের নিকট প্রকাশিত হয় সেই কামনা করবে' (কোরআন ৬৬ : ৯)। আল্লাহতা'লা তাদেরকে এই বলে সম্বোধন করবেন "হে শান্তিতে অবস্থানকারী আত্মা তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাগমন কর, তুমি ও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট আর তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর" (কোরআন ৮৯ : ২৮-৩১)। কোরআনের উল্লেখিত এই আয়াতে পুণ্যশীলদেরকে

এই কথাই বলা হয়েছে যে যেহেতু তারা পার্থিব জীবনে অবিরামভাবে আল্লাহর বিভিন্ন গুণরাজিকে অনুসন্ধান করেছে এবং নিজেদের জীবনে তার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছে তার পূর্ণ প্রতিফল হিসাবে পরলোকে তারা অনন্ত জীবনের লক্ষ্যে অগ্রগামী হতে থাকবে। তাদের এই ক্রমোন্নতি উত্তরোত্তর উন্নতির দিকেই ধাবিত হবে। আর যেহেতু আল্লাহর গুণরাজি —অনন্ত, তাই আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হবার মানুষের অভিলাষ ও তার যাত্রা পথ হবে বিরামহীন। যাত্রার প্রতিটি নূতন স্তরেই বিধাতার আশিস ও অনুগ্রহের নব নব দানে, সেই জীবনের আনন্দ ভাণ্ডার হবে পরিপূর্ণ।

———

ইসলামে মুক্তির মাপকাঠি

বৈদিক ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলাম এই তিনটিই নাজাত বা মুক্তিতে বিশ্বাসী। সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে জীবনের অবসানে মানুষের আর একটি জীবন রয়েছে সেখানে মানুষ নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করবে। অন্য ভাষায় মানুষ তার পুণ্য কর্মের ফলে বেহেস্ত ও পাপের ফলে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। কম বেশী মূলতঃ উপরোক্ত সব ধর্মই নাজাত বা মুক্তিতে বিশ্বাসী।

পুনর্জন্মবাদ বৈদিক ধর্মের একটি মৌলিক বিশ্বাস যার ফলে মানুষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে জন্ম পরিগ্রহ করে এবং অবশেষে তাঁকে একটি সীমার মুক্তি খানায় আশ্রয় দান করা হয়। যার অবসানের পর পুনরায় তাকে ভিন্ন ভিন্নরূপে জন্ম ধারণ করতে হয়। অর্থাৎ তারা একটি সীমা-বদ্ধ নাজাত বা মুক্তিতে বিশ্বাসী। বৈদিক দর্শনের উপরোক্ত বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা এই বিশ্বাসও পোষণ করে থাকেন যে ঈশ্বর মানবকুলের পাপ মোচনে সম্পূর্ণ অক্ষম। প্রত্যেক পাপীকে তার কর্মফল অনুযায়ী, কুকুর, শুকর বানর, প্রভৃতি আকার ধারণ পূর্বক জন্ম নিতে হবে। মূল কথা বৈদিক দর্শন অনুযায়ী নাজাত বা চিরমুক্তির কোন প্রশ্নই আসে না।

খৃষ্ট ধর্ম অনুযায়ী মুক্তির আকাঙ্খা প্রত্যেক মানুষের ভিতরই বিদ্যমান রয়েছে। তবে পাপী মানবের জন্য এই ধর্মে

মুক্তিলাভের কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ তাদের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে সমস্ত আদম সন্তান পাপী সাব্যস্ত হয়েছে। খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী খোদা মানবের পিতা বটে কিন্তু এরূপ পিতা যে তার কোন সন্তানকে পাপের প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকে ক্ষমা করতে অপারক ; এজন্য স্বয়ং আল্লাহ্ মানুষের মুক্তির উদ্দেশ্যে বহু চিন্তার পর আজ হতে উনবিংশ শতাব্দি পূর্বে একটি অভিনব পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন, এবং তাঁর একমাত্র জাতপুত্রকে ইহুদিদের হাতে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়ে ও তিন দিবারাত্রি হাবিয়া দোযখে অবরুদ্ধ রাখতে বাধ্য হলেন। যারা যীশু খৃষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুতে বিশ্বাসী তারা মুক্তিলাভ করবে। কিন্তু এই মুক্তিলাভের ফলে মানব গোষ্ঠীর পূর্বকৃত সমস্ত পাপের ক্ষমা যদিও সম্ভব হবে কিন্তু পরবর্তী সময়ে যদি কোন পাপ করা হয় তাহলে তার শাস্তি তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী নরক চিরস্থায়ী এবং অনন্ত অসীম কাল পর্যন্ত প্রত্যেক মানবকে সেখানেই অবস্থান করতে হবে। খৃষ্টানদের এই বিশ্বাস অনুযায়ী নাজাত বা মুক্তি একটি কল্পনা মাত্র। জগতে কি এরূপ খৃষ্ট মতাবলম্বী বিদ্যমান রয়েছে যে যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুতে বিশ্বাস স্থাপনের পর আর কোন পাপ করে নাই ?

পাপ থেকে পরিত্রাণ অথবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে রক্ষা পাওয়ার নামই নাজাত বা মুক্তি। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গিতে

পাপ থেকে মুক্তি লাভই মানব জীবনের পরম ও চরম উদ্দেশ্য নয় বরং তারও উর্ধ্বে ইসলাম মানবের জন্য "ফওজ ও ফালাহ" বা অভিপ্রেত সাফল্য দানের অঙ্গীকার করেছে। অর্থাৎ ইসলাম অনুযায়ী মানব সৃষ্টির মোক্ষ উদ্দেশ্য তার স্রষ্টার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীব হিসাবে মানুষকে আল্লাহর রঙ্গে রঙ্গীন হওয়ার আদেশ কোরআন দিয়েছে। পাপ হতে মুক্তিলাভ করাও মানুষের একটা মহৎ কামনা বটে— কিন্তু তার উর্ধ্বে স্রষ্টার যাবতীয় গুণাবলী নিজের মধ্যে প্রতি-ফলিত করাও একটি উল্লেখযোগ্য কামনা।

ইহাকেই ইসলাম "ফালাহ্" আখ্যা প্রদান করেছে। বস্তুতঃ ইসলাম অন্যান্য ধর্ম থেকে আরো অগ্রসর হয়ে মানবের জন্য ফালাহ্ প্রদানের অঙ্গীকার করেছে।

ইসলামী মতবাদ অনুযায়ী পাপীদের জন্য নরক বা দোযখ চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেক পাপীই নরকে তার পাপের প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করার পর নরক হতে মুক্তিলাভ করবে এবং সকল মানুষই একদিন আল্লাহর অনন্ত অসীম বেহেস্তের অধিকারী হবে। মূলকথা প্রত্যেক মানবের ভিতরেই পাপ ও পুণ্য উভয় শক্তি বিদ্যমান রয়েছে এবং ইহজগতেই মানুষ চেষ্টা ও কর্মফল দ্বারা পাপ হতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।

ইসলামী মতবাদ অনুযায়ী যেখানে পাপ করার প্রবৃত্তি মানবের অন্তর হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে সেইরূপ পাপ হতে

মুক্তি বা পরিত্রাণের উৎসও মানবাত্মার অন্তরেই নিহিত রয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য এই সুসংবাদ দিয়েছেন—"লা তাক্‌নাতু মির রাহ্‌মাতিল্লাহ্ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফেরু জুনুবা জামিয়া।" অর্থাৎ হে পাপী মানব! আল্লাহ্‌র রহমত হতে তোমরা নিরাশ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সমুদয় পাপ ক্ষমা করবেন।

সুতরাং ইসলামের এই আশার বাণী সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে অফুরন্ত আশা ও আকাঙ্খার সঞ্চার করেছে. কারণ পাপের বোঝা মানুষকে হতাশার দিকে ঠেলে দেয় এবং আশা-আকাঙ্খা মানুষকে সত্যিকার শান্তিপূর্ণ জীবন ধারণের প্রেরণা দান করে। সুতরাং ইসলামের এই আশার বাণী মানবজাতির জন্য একমাত্র সম্বল।

প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানই আল্লাহর এই বাণীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন যে বিচারের দিনে যখন মানবজাতির পাপ ও পুণ্যের ওজন করা হবে—তখন যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা দোযখের অধিবাসী হবে এবং যাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে তারা স্বর্গবাসী হবে (সূরা আ'রাফ ৮ ও ৯ আয়াত)।

মূলকথা পৃথিবীর এই পরীক্ষায় যারা ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫১ নম্বর লাভ করবে তারা পাশ বলে গণ্য হবে ও বেহেস্তে দাখিল হবে। তদোর্ধ্বে যারা অর্জন করবে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ নম্বর অনুযায়ী দর্জা বা পদমর্যাদা লাভ করবে। এটি ইসলামের কত সুন্দর ব্যবস্থা যা দ্বারা সব ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান (রাঃ)